আরব জাতি, ইসলামের পূর্বে ও পরে

﴿ العرب قبل الإسلام وبعده ﴾

[বাংলা - bengali - البنغالية]

সায়্যেদ আবুল হাসান আলী নদভী

সম্পাদানা : ইকবাল হোছাইন মাছুম

2010 - 1431

islamhouse.com

﴿ العرب قبل الإسلام وبعده ﴾

« باللغة البنغالية »

أبو الحسن علي الندوي

مراجعة: إقبال حسين معصوم

2010 - 1431

islamhouse.com

ইসলামের পূর্বে আরবদের অবস্থা কেমন ছিল এবং ইসলামের পরে কেমন হল

ইসলামের পূর্বে আরবদের আক্বীদা-বিশ্বাস ও মানসিক চিন্তাধারা

আরবদের মধ্যে আল-আরব আল আদনানিয়া নামে প্রসিদ্ধ জনগোষ্ঠি যাদের বংশ পরিক্রমা ইসমাইল হতে আরম্ভ হয়েছিল, তারাই প্রকৃত পক্ষে ইসলামের আগমনের পূর্বে সঠিক দ্বীনের অনুসারী ও তাওহীদে বিশ্বাসী ছিল। তারা এক আল্লাহর ইবাদত করত এবং দ্বীনে ইবরাহীমের অনুসরণ করত। ইসমাইলী বংশধরদের প্রচেষ্টা ও তাদের একনিষ্ঠ দাওয়াতের কারণেই সমগ্র আরব ভূখন্ডের আনাচে-কানাচে সঠিক দ্বীন তথা তাওহীদের ব্যাপক প্রচার-প্রসার ঘটেছিল। দীর্ঘ এক যুগ অতিবাহিত হওয়া পর্যন্ত আরবরা কোন প্রকার শিরক ও কুসংস্কারে লিপ্ত হয়নি। তারা এক আল্লাহর ইবাদত করত, তাদের মধ্যে কোন শিরক তখন পর্যন্ত স্থান পায়নি। তবে নবুওয়তের যুগ থেকে তাদের সময় অনেক দীর্ঘ হয়ে যাওয়া এবং কোন প্রকার দাওয়াত বা সঠিক দ্বীনের আহ্বানকারী না থাকা তাদের মধ্যে শিরকের অনুপ্রবেশের একটি রাস্তা তৈরি করে নিল। এরই সূত্র ধরে তাদের থেকেই আমর ইবনে লুহাই নামে এক লোকের আর্বিভাব হল, যে এ সুযোগটিকে কাজে লাগালো। লোকটি তাদের মাঝে খুব সম্মানী ও মর্যাদার অধিকারী ছিল। কোন কারণে লোকটি সিরিয়ায় গেলে, সেখানে দেখতে পেল, এখানকার লোকেরা মূর্তির পূজা করছে। তার নিকট তাদের মূর্তি পূজা করাটা খুব পছন্দ হয়। সে ভাবলো যেহেতু শিরিয়া, আসমানী কিতাব ও আসমানী ধর্মসমূহের আবাসভূমি সুতরাং এখানে যে দ্বীন চলবে তাই হবে সত্য দ্বীন এবং এখানকার লোকেরাই হবে সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত জনগোষ্ঠী। তাদের বাইরে যারা থাকবে তারা হবে ভ্রষ্ট, পথহারা ও বিপথগামী। তারপর সে সিরিয়া থেকে তার সাথে 'হুবল' নামক একটি দেবতা মক্কায় নিয়ে আসল। মক্কায় এনে দেবতাটিকে কাবা ঘরের মাঝে স্থাপন করল এবং মক্কার লোকদেরকে দেবতাটির ইবাদাতের জন্য আহবান করল। তারা তার ডাকে সাড়া দিল। আর এভাবেই মক্কাবাসীরা দেবতার ইবাদাত করতে আরম্ভ করল। মক্কাবাসীদের দেখে দেখে হিজাযের আরবরাও তাদের অনুকরণ করল। কারণ তারা ছিল বাইতুল্লাহর অভিভাবক এবং হেরমের অধিবাসী। সুতরাং তারা যা করবে আশপাশের লোকেরা তারই অনুকরণ করবে, এটা ছিল একেবারেই স্বাভাবিক। এভাবে কিছুদিন চলতে চলতে সমগ্র আরবে দেবতার পূজা তথা শিরক ছড়িয়ে পড়ল।

আর তাদের চিন্তা চেতনা ও বিশ্বাসে জাহিলিয়্যাত সুস্পষ্ট হয়ে উঠল, যার প্রভাবে তাদের জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে জাহিলিয়্যাতের অন্ধকার ছড়িয়ে পড়ল। যদিও তারা বিশ্বাস করত যে, আল্লাহই স্রষ্টা, তিনিই মালিক এবং তিনিই পরিচালনাকারী। তারপরও তারা এই সকল ইলাহগুলোর ইবাদত করত। কারণ, তারা তাদের জাহিলিয়্যাতকে অকাট্য মতে করত।

আল্লাহ বলেন,

أَلَا لِلَّهِ ٱلدِّينُ ٱلْخَالِصُ ۚ وَٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُوا۟ مِن دُونِهِۦٓ أَوْلِيَآءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَآ إِلَى ٱللَّهِ زُلْفَىٰٓ إِنَّ ٱللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِى مَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى مَنْ هُوَ كَـٰذِبٌ كَفَّارٌ ﴿٣﴾ الزمر:

জেনে রেখ, আল্লাহর জন্যই বিশুদ্ধ ইবাদত–আনুগত্য। আর যারা আল্লাহ ছাড়া অন্যদেরকে অভিভাবক হিসেবে গ্রহণ করে তারা বলে, 'আমরা কেবল এজন্যই তাদের 'ইবাদত করি যে, তারা আমাদেরকে আল্লাহর নিকটবর্তী করে দেবে।' যে বিষয়ে তারা মতভেদ করছে আল্লাহ নিশ্চয় সে ব্যাপারে তাদের মধ্যে ফয়সালা করে দেবেন। যে মিথ্যাবাদী কাফির, নিশ্চয় আল্লাহ তাকে হিদায়াত দেন না। (সূরা যুমার: ৩)

তারা দেবতাগুলোকে তাদের মধ্যস্থতাকারী সাব্যস্ত করত। এ সব ইলাহগুলোর মাধ্যমে তারা আল্লাহর নিকট পৌঁছতে পারবে বলে বিশ্বাস করত। এ ছাড়াও তাদেরকে তারা তাদের দোয়ায় শরিক করত। কোন কোন ইবাদতে তারা তাদের ইলাহগুলোর দিকেই মুখ করে দাঁড়াতো। তাদের অন্তরে সুপারিশের চিন্তা বদ্ধমূল ছিল। অর্থাৎ, তারা তাদের দেবদেবীদের আল্লাহর দরবারে সুপারিশকারী বলে বিশ্বাস করত। তাদের এ বিশ্বাস দিন দিন এমন উন্নতি লাভ করল, যার ফলে তারা বিশ্বাস করতে লাগলো যে, সুপারিশকারীদের ক্ষমতা শুধু সুপারিশের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয় বরং তারা মানুষের উপকার বা ক্ষতি করার মত ক্ষমতাও সংরক্ষণ করে। ধীরে ধীরে তাদের আকীদা আরো উন্নতি লাভ করে এবং এক পর্যায়ে শিরকে পরিণত হয়। অতঃপর তারা আল্লাহকে বাদ দিয়ে নিজেদের দেবদেবীগুলোকে ইলাহ হিসেবে গ্রহণ করা শুরু করলো। তারা বিশ্বাস করত যে, জগতের পরিচালনায় আল্লাহর সাথে তাদের দেবদেবীদেরও অংশিদারিত্ব ও ক্ষমতা রয়েছে। তারা মানুষের উপকার বা ক্ষতি করা ও না করা, কল্যাণ ও অকল্যাণ এবং দেয়া ও না দেয়াসহ যাবতীয় ক্ষমতাই রাখে। তাদের পূর্বপুরুষেরা আল্লাহর জন্য উলুহিয়্যাত ও রবুবিয়্যাতে কুবরাকে স্বীকার করত, আর মূর্তিগুলোকে শুধুমাত্র সুপারিশকারী এবং আল্লাহর বন্ধু বলেই ক্ষ্যান্ত ছিল। কিন্তু পরবর্তীরা তাদের ইলাহগুলোকে আল্লাহর সাথে শরিক করা শুরু করে দিল এবং তারা এই বিশ্বাস করত যে, তাদের ইলাহগুলোর মধ্যেই কল্যাণ-অকল্যাণ, উপকার-ক্ষতি এবং সৃষ্টি ও মৃত্যু দেয়ার মত ক্ষমতা আছে। এভাবেই জাতি তার সকল ক্ষেত্রে নগ্ন পৌত্তলিকতা ও মূর্তি পূজায় নিমজ্জিত হয়ে পড়ল ।

তাদের প্রতিটি মোড়, গোত্র ও শহরের জন্য নির্দিষ্ট মূর্তি ছিল এমনকি প্রতিটি ঘরের জন্যও একটি করে মূর্তি তারা সংরক্ষিত রাখতো।

আল্লামা কালবী রহ. বলেন, মক্কার প্রতিটি বাড়ীর মালিকের জন্য একটি করে মূর্তি ছিল, তারা বাড়ীতে বসেই তার ইবাদত করত। কোথাও ভ্রমনের ইচ্ছা করলে, ঘর থেকে বের হওয়ার পূর্ব মুহূর্তে তারা মূর্তিগুলোকে স্পর্শ করত। আর যখন সফর থেকে ফিরে আসতো তখনও ঘরে প্রবেশ করা মাত্রই সেগুলোকে মাসেহ করতো। এভাবেই আরব জাতির মধ্যে মুর্তি পূজার প্রসিদ্ধতা ও ব্যাপকতা লাভ করল, তাদের অবস্থা এমন ছিল যে, কেউ একটি ঘর বানাতো আবার কেউ মূর্তি বানাতো। আর যদি কেউ ঘর কিংবা মূর্তি বানাতে সক্ষম না হতো তখন, সে হেরেমের সামনে অথবা হেরম ছাড়া অন্য কোথাও তার পছন্দ মত একটি পাথর দাঁড়া করাতো। তারপর বাইতুল্লাহর তাওয়াফের মতই তার আশ পাশে তওয়াফ করত। তারা নিজেদের ইলাহগুলোর নাম 'আনসাব' করে রাখতো। কাবাভ্যন্তরে- যে ঘরকে একমাত্র এক আল্লাহর ইবাদতের জন্য নির্মাণ করা হয়েছিল - তার ও আশ পাশে ষাটটির মত মূর্তি স্থাপিত ছিল।[১] তাদের পূজা শুধু দেবদেবীর পূজায়ই সীমিত ছিল না। ধীরে ধীরে তারা দেবদেবীর পূজা করা হতে পাথরের পূজায় উন্নিত হয়।

ইমাম বুখারির রহ. বর্ণনা করেন– আবু রাজা আল আতারদী বলেন, আমরা পাথরের ইবাদত করতাম, যখন কোথাও একটি ভালো পাথর দেখতাম তখন পুর্বের পাথরটি ফেলে দিতাম এবং তার চেয়ে ভালটির পূজা করতাম। আর যখন কোন পাথরই পেতাম না, তখন মাটির ধূলোকে একত্র করতাম, তারপর একটি ছাগল নিয়ে এসে তার উপর তার দুধ দোয়াইয়ে দুধগুলো ধুলোর উপর দিয়ে আমরা তার তাওয়াফ করতাম।[২]

আল্লামা কালবী রহ. বলেন, কোন ব্যক্তি সফরে গেলে যখন সে কারো বাড়ীতে মেহমান হত, তখন সে চারটি পাথর সংগ্রহ করত, তারপর দেখত কোন পাথরটি বেশি সুন্দর, যেটি বেশি সুন্দর বলে মনে হত

[১] বুখারী

[২] ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين আবুল হাসান আলী নদবী ৪৭

তাকে সে নিজ রব হিসেবে গ্রহণ করত। আর তার ভাগ্যের জন্য অপর তিনটিকে অনর্থক বলে রেখে দিত। আর যখন সেখান থেকে প্রস্থান করত তখন পাথরগুলো ফেলে আসত।

আরবদের জন্য অনেকগুলো উপাস্য সাব্যস্ত হলো– ফেরেশতা, জিন ও নক্ষত্রসমূহ ইত্যাদি। ফেরেশতা সম্বন্ধে তাদের বিশ্বাস ছিল তারা আল্লাহর মেয়ে। তাই তারা তাদেরকে তাদের জন্য আল্লাহর দরবারে সুপারিশকারী বলে বিশ্বাস করতো এবং এই বিশ্বাসেই তারা তাদের ইবাদত করতো। তাদেরকে তারা আল্লাহর নিকট পৌঁছার মাধ্যম হিসেবে গণ্য করতো। অনুরূপভাকে তারা জিন থেকেও কতক জিনকে আল্লাহর শরিক বা অংশিদার বলে বিশ্বাস করতো এবং তারা তাদের কুদরত ও প্রভাব সম্পর্কে বিশ্বাস করতো। ফলে জিনদের তারা ইবাদত করত।[৩]

আর যে সব আরবের বংশানুক্রমা কাহতানের সাথে মিলে, তাদের চিন্তা চেতনা ও বিশ্বাসের অবনতি আরবে আদনানীয়া হতে কোন ক্রমেই কম ছিল না, তাদের হামির গোত্র সূর্যের ইবাদত করত, লাখাম ও যুজাম করত নক্ষত্রের ইবাদত আর তাঈ গোত্র করত সুহাইল নক্ষত্রের পূজা[4]।

বেশিরভাগ আরব যারা দেবদেবীর পূজা করাটাকে তাদের দ্বীন বলে বিশ্বাস করত তাদের এ পূজার সাথে তারা আরো দেখতে পেল ইহুদীদের যারা ফিলিস্তিন থেকে হিজরত করে ইয়াসরাব, খায়বর ও তাইমা ইত্যাদি আরবের বিভিন্ন স্থানে অবস্থান করেছিল। আর মূর্তিপূজা ইয়ামনে প্রবেশ করল তাব্বান আসাদ আবী কুরাইব এর দিক দিয়ে।

এ দিকে ৩৪০ সালে ইয়ামনের উপর আবিসিনিয়ার আক্রমণের সুবাদে দ্বীনে নাসরানি আরব দেশে প্রবেশের সুযোগ পেল। নাসারারা আরবে গাসানাহ গোত্রের অনুগত ছিল, এবং তারা ছাড়াও আরো কয়েকটি গোত্র যেমন- তাগলীব, তাঈ, এ ছাড়াও আরো যে সব গোত্র রোমানদের প্রতিবেশি ছিল, তারা তাদেরও অনুগত ছিল।

আর মুজুসীরা (অগ্নিপূজকরা) আরব জাহানে ইরাকের দিক দিয়ে অবস্থানরত পারস্যদের প্রতিবেশি ছিল। তারা বাহরাইন, হিজর ও তার আশে পাশে বসবাস করত। আরব সাগরের উপকূলেও তারা অবস্থান করত। আর লা-দ্বীনিয়ারা আরবের ইরাক ও উপসাগরীয় অঞ্চলের উপকূলে বসবাস করত।[৫]

আল্লাহর তাওহীদের দিকে দাওয়াত দেয়া ও শিরক হতে ভয় প্রদর্শন করার মিশনটি ছিল ইসলামের সর্বপ্রথম মিশন। আর মনে রাখতে হবে, এ মিশনের উপর ভিত্তি করেই জমিনে মানব জাতির জীবনের গতিবিধি নির্ণিত হয়; তাদের বিশ্বাস, চিন্তা-চেতনা, তাদের চারিত্রিক গুণাবলী, আচার-আচরণ, পরিকল্পনা, যাবতীয় লেন-দেন, আল্লাহর সাথে তাদের সম্পর্ক, তার নিজের ও সমাজের সাথে যোগাযোগ, সমগ্র জগতের সাথে যুদ্ধ করা বা নিরাপত্তা বিধান করা, রাজনীতি, অর্থনীতি, তার জ্ঞানভান্ডার ও বিজ্ঞান, এক কথায় মানব জাতির সব কিছুই নির্ধারিত হয়ে থাকে সেই তাওহীদের বিশ্বাসের উপর ভিত্তি করেই।

এ মিশনের ভিত্তিতেই নির্ধারিত হবে তার আখেরাতের শেষ পরিণতি। মৃত্যুর পর জান্নাতে যাবে নাকি জাহান্নামে...? চিরস্থায়ী নেয়ামতের অধিকারী হবে... নাকি স্থায়ী শাস্তির অধিকারী হবে...?

মানব জীবনে এমন কোন গুরুত্বপূর্ণ মিশন পাওয়া সম্ভব হবে কি? যে মিশন সমগ্র জগত বা সমগ্র মাখলুকের সব কিছুকে একত্র করে কোন একটি মূলনীতির আওতায় নিয়ে আসে?!!

ইসলামের আবির্ভাবের লক্ষ্যই হল, মানুষকে আল্লাহর তাওহীদের দিকে ডাকা এবং শিরক হতে তাদেরকে দূরে রাখা। ফলে ইসলাম এ অভীষ্ট লক্ষ্যটিকেই বাস্তবায়নের জন্য সর্বাধিক গুরুত্বারোপ করেছে এবং এর উপরই ইসলামের সবকিছু কেন্দ্রীভূত রেখেছে। কুরআনে এ বিষয়টিকে জোরালোভাবে বলার কারণ এই

[৩] ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين আবুল হাসান আলী নদবী ৪৭

[4] জাহিলিয়্যাত ও ইসলামের মাঝে আরবদের চরিত্র পৃ:২৮৯ ড. মুহাম্মদ আন-নাছের।

[5] রাহীকুল মাখতুম, সফীউর রহমান মুবারকপুরি।

নয় যে, কুরআন যাদের সম্বোধন করেছে তারা কেবলই মুশরিক ছিল! কারণ, কুরআন মদীনাতে মুসলমান-মুমিনদেরকেও ঈমান আনার প্রতি, অনুরূপভাবে তাওহীদের প্রতি আহ্বান করেছে। তাদেরকেও শিরক পরিহার করার নির্দেশ দিয়েছে। তাওহীদের সাথে শিরকের মিশ্রণ হতে বিরত থাকতে কঠোর নির্দেশ দিয়েছে। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

وَٱعْبُدُوا۟ ٱللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا۟ بِهِۦ شَيْـًٔا ۖ وَبِٱلْوَٰلِدَيْنِ إِحْسَـٰنًا وَبِذِى ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْيَتَـٰمَىٰ وَٱلْمَسَـٰكِينِ وَٱلْجَارِ ذِى ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْجَارِ ٱلْجُنُبِ وَٱلصَّاحِبِ بِٱلْجَنۢبِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَـٰنُكُمْ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا ﴿٣٦﴾ النساء: ٣٦

তোমরা ইবাদাত কর আল্লাহর, তাঁর সাথে কোন কিছুকে শরিক করো না। আর সদ্ব্যবহার কর মাতা-পিতার সাথে, নিকট আত্মীয়ের সাথে, ইয়াতীম, মিসকীন, নিকট আত্মীয়– প্রতিবেশী, অনাত্মীয়– প্রতিবেশী, পার্শ্ববর্তী সাথী, মুসাফির এবং তোমাদের মালিকানাভুক্ত দাস-দাসীদের সাথে। নিশ্চয় আল্লাহ পছন্দ করেন না তাদেরকে যারা দাম্ভিক, অহঙ্কারী। (সূরা নিসা: ৩৬)

এর মূল কারণ হল, মানুষের প্রকৃত স্বভাবই হল, সে কারো না কারো অনুগত হবেই এবং কারো না কারো ইবাদতে লিপ্ত থাকবেই। সে হয়তো এক আল্লাহর ইবাদত করবে এবং তার সাথে কাউকে শরীক করবে না অথবা আল্লাহর সাথে অন্য কোন ইলাহর ইবাদত করবে কিংবা আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন ইলাহর ইবাদত করবে।

মোট কথা, মানুষ ইবাদত না করে থাকতেই পারে না। কোন না কোন সত্ত্বার ইবাদত তাকে করতেই হয়। এটা তার স্বভাবের সাথে জড়িত। দুনিয়াতে এমন কেউ নাই, যে কারো না কারো ইবাদত করে না। যদি কোন ব্যক্তি এ দাবী করে যে, আমি সকল প্রকার গোলামী হতে মুক্ত, তার সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿ أَفَرَءَيْتَ مَنِ ٱتَّخَذَ إِلَـٰهَهُۥ هَوَىٰهُ وَأَضَلَّهُ ٱللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِۦ وَقَلْبِهِۦ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِۦ غِشَـٰوَةً فَمَن يَهْدِيهِ مِنۢ بَعْدِ ٱللَّهِ ۚ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴿٢٣﴾ ﴾ الجاثية: ٢٣

তবে তুমি কি তাকে লক্ষ্য করেছ, যে তার প্রবৃত্তিকে আপন ইলাহ বানিয়ে নিয়েছে? তার কাছে জ্ঞান আসার পর আল্লাহ তাকে পথভ্রষ্ট করেছেন এবং তিনি তার কান ও অন্তরে মোহর মেরে দিয়েছেন। আর তার চোখের উপর স্থাপন করেছেন আবরণ। অতএব আল্লাহর পর কে তাকে হিদায়ত করবে? তারপরও কি তোমরা উপদেশ গ্রহণ করবে না? (সূরা জাসিয়া : ২৩)

অবশ্যই এ অবস্থাতেও সে একজন গোলাম, তবে আল্লাহ ভিন্ন অন্যের গোলামী করে। মানুষ যখন গাইরুল্লাহর ইবাদাতকারী তাই সেতো মুশরিকই হবে। তখন তাকে তার ভ্রান্ত ইলাহসমূহের ভ্রান্তি ভুল পথে পরিচালনা করতে থাকবে। তার যাবতীয় মেধা ও শক্তি তার ভ্রান্ত ধারণার পিছনে ব্যয় হবে যে ভ্রান্ত ধারণার সে উপাসনা করে, তার প্রভৃত্তি তাকে স্বীয় গোলামীর শৃঙ্খলে তাকে সর্বদা আবদ্ধ করে রাখবে। মানবরাই তার জন্য যাবতীয় আইন কানুন রচনা করবে। ফলে মানুষই তাদের নিজদের মধ্যে কতক হবে গোলাম আবার কতক পরিণত হবে নেতায়। নেতারা কর্তৃত্ব ও শাসন করবে এবং তাদের খেয়াল খুশিমত অসংখ্য বিধান তাদের উপর চাপিয়ে দেবে। আর প্রজা ও অনুগতরা তাদের নির্যাতনের শিকার হবে। ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে, জাহিলিয়্যাতের কোন যুগকেই এর ব্যতিক্রম দেখতে পাওয়া যাবে না।[৬]

[৬] লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু আক্বীদা বিশ্বাস শরীয়ত ও জীবন পদ্ধতির বিবেচনায় পৃষ্ঠা: ৪৩ মুহাম্মদ কুতুব।

চারিত্রিক অবস্থা:
ইসলামের আগমনের প্রাক্কালে আরবদের মাঝে উৎকৃষ্ট ও নিকৃষ্ট উভয় চরিত্রের সংমিশ্রণ ছিল লক্ষণীয়। ফলে তারা তাদের উন্নত চরিত্রের মাধ্যমে যেমন উন্নতির শীর্ষে পৌঁছে ছিল আবার দুশ্চরিত্র-অন্যায়-অশ্লিলতার কারণে ইতিহাসের আস্তাকুঁড়ে নিক্ষিপ্ত হয়েছিল। ইসলামের আবির্ভাবের পর ইসলাম তাদের চরিত্রের গতিকে নিরঙ্কুশ করে, তাদের চলার পথ সুগম করে, মানষিকতাকে নির্মল করে এবং তাদের নানা নষ্ট অবকাটামোকে একটি মানে নিয়ে আসে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, নিশ্চয় আমাকে কেবল উন্নত চরিত্রের উৎকর্ষ সাধন ও বাস্তবায়নের জন্য পাঠানো হয়েছে।[7]
যে সব উন্নত চরিত্রের সমাবেশ তাদের মাঝে ঘটার কারণে তারা উচ্চ মর্যাদা লাভ করে, পৃথিবীর আনাচে কানাচে তাদের সুখ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে এবং যদ্বারা তাদের নিদর্শনসমূহ পৃথিবী ব্যাপি প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল তন্মধ্যে তিনটি চরিত্র ছিল বিশেষ উল্লেখযোগ্য ও সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ:
১। বদান্যতা বা দানশীলতা
২। সাহস
৩। আত্মমর্যাদাবোধ।
এ ছাড়াও তাদের অধিকাংশরাই যেসব গুণের অধিকারী ছিলেন- তা হল, সৎচরিত্র, অশ্লিলতা মুক্ত, সততা, আমানতদারী-বিশ্বস্ততা, সহনশীলতা ও গাম্ভির্যতা। তবে তাদের মধ্যে কতক সম্প্রদায় এমনও ছিল যারা অধ:পতনের গহ্বরে পতিত হয়েছিল এবং দুশ্চরিত্র, মিথ্যা, অবিশ্বাস, খিয়ানত, কৃপণতা, বিশ্বাসঘাতকাতা ইত্যাদি অপকর্মে একেবারে শীর্ষে পৌঁছেছিল। যার কারণে তাদের এ যুগকে বর্বরতার যুগ বলে অভহিত করা হত।
ইসলামের আগমের ফলে আরববিশ্ব যেন নতুনভাবে জন্মলাভ করল। যেন তাদের হারিয়ে যাওয়া ঐতিহ্য ফিরে পেল এবং হৃত রূপ ফিরে আসল। আমি এখানে কতক উন্নত চরিত্র এবং এসব চরিত্রগুলো প্রতিষ্ঠায় ইসলামের প্রভাব, এসবকে ইসলামের স্বীকৃতি দেয়া, এগুলোকে তাদের আত্মার উপর নেতৃত্বদানকারী রূপে পরিণত করা এবং তাদের অন্তরসমূহকে তাওহীদের প্রতি আকৃষ্ট করার একটি চিত্র তুলে ধরার প্রয়াস পাব।
ইসলাম ও দানশীলতা:
দানশীলতা ও বদান্যতা আরবদের একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল। এ দানশীলতায় তারা বিশেষভাবে প্রসিদ্ধি ও সুখ্যাতি অর্জন করেছিল। তাদের দানশীলতার উপর প্রাধান্য লাভ করবে, এমন কোন ব্যক্তি তাদের নিকট আর অবশিষ্ট ছিল না। অনেক সময় দেখা যেত উটের মালিক দুর্ভিক্ষের সময় তার জীবিকা অবলম্বনের একমাত্র উপকরণ সেই উটটিকে নিজ গোত্রীয় লোকদের জন্য জবেহ করে দিত। নিজ পরিণতি সম্পর্কে বিন্দু পরিমাণও চিন্তা করতো না। আবার কখনো দেখা যেত তার আনন্দের ধন একমাত্র উটটিকে আগত মেহমানের মেহমানদারির জন্য জবেহ করে দিত যাদেরকে শুষ্ক ও জনমানবশূন্য মরুভূমি তার নিকট মেহমান হিসেবে ঠেলে দিত। কারণ, আরবরা সাধারণত অনুর্বর মরুভূমিতে বসবাস করত; যেখানে সাধারণত: খাদ্য সামগ্রী ও জীবনোপকরণ খুব কমই পাওয়া যেত। তাদের জীবন-যাপন ছিল যাযাবরি ও ঘূর্ণয়মান। তাদের প্রায় সকলেই খাদ্য সামগ্রী ও জীবনোপকরণ শেষ হয়ে যাওয়ার মুখোমুখি হত। তাই সে আজ একজন মেহমানের মেহমানদারী করত, কারণ আগামীকাল তাকেও অপরের মেহমানদারির মুখাপেক্ষী এবং অন্যের তাঁবুতে গিয়ে আশ্রয় নিতে হতে পারে। কোন ব্যক্তির জন্য মরুভূমির এখানে সেখানে নির্মিত তাবুগুলো ছাড়া আর কোন বিশ্রাম বা আশ্রয়স্থল ছিল না যেখানে গিয়ে

[৭] আহমাদ ৮৫৯৫ আল্লামা নাসির উদ্দিন আলবানী হাদীসটি সহীহ বলে আখ্যায়িত করেছেন।

আশ্রয় বা বিশ্রাম নিবে। ফলে এ সব তাবুগুলোকে তারা তাদের নিজদের বাঁচার একমাত্র অবলম্বন মনে করত।[8].

তারা ছিল অত্যধিক দানশীল । তার একটি কারণ হল তারা প্রশংসা কুড়ানো ও সুনাম অর্জনকে খুব পছন্দ করত। এ কারণে তাদের নিকট তাদের ধন-সম্পদ প্রসংশা কুড়ানো ও নেতৃত্ব লাভের উপকরণ হিসেবেই বিবেচিত হত, ধন-সম্পদ কখনোই তাদের নিকট তাদের মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হিসেবে পরিগণিত হত না। তাদের লক্ষ্য ছিল তারা মানুষের মুখে নিজেদের প্রশংসা ও গুণগান শোনবে।
হাতেম তাঈ বলেন,

يقولون لي أهلكت مالك فاقتصد   وما كنت لولا ما تقولون سيداً

তারা আমাকে বলে তুমিতো তোমার ধন-সম্পদ নষ্ট করে ফেলছ, সুতরাং তুমি মিতব্যয়ী হও। আমি যদি তা না করতাম তবে তোমরা আমাকে যে, সরদার বলছ তা বলতে না।
তাদের বদান্যতা এত প্রবল ছিল যে, তাদের কেউই কখনো একা আহার করতো না। হাতেম তাঈ-এর স্ত্রী তার জন্য খানা তৈরি করলে তিনি তাকে বলতেন, তুমি একজন মেহমান তালাশ কর! যাতে সে আমার সাথে খানায় শরিক হয়।
তিনি বলতেন-

أيا ابنة عبد الله وابنة مالك   ويا ابنة ذي البردين والفرس الورد

إذا ما صنعت الزاد فالتمسي له   أكيلاً فإني لســت آكله وحدي

أخاً طارقاً أو جار بيت فإنني   أخاف مذمات الأحاديث من بعدي

وإني لعبد الضيف ما دام ثاوياً   وما في إلا تلك من شيمة العبد

হে! আব্দুল্লাহ ও মালেক তনয়া , হে দুই চাদর এবং ঘোড়া ও গোলাপ ওয়ালার কন্যা। যখন তুমি খাদ্য তৈরী করবে একজন মেহমান তালাশ করবে, চাই সে আগন্তুক হোক বা মেহমান কিংবা কোন প্রতিবেশী হোক। কারণ আমি একা একা খাওয়ার লোক নই। আর আমি ভয় করি যে, আমার পর লোকেরা আমার নিন্দা করবে। আর আমি মেহমানের মেহমানদারি করেই যাব– যত দিন সে আমার নিকট অবস্থান করে। আর এতো কেবলই একজন গোলামের প্রকৃতি ও স্বভাব।
আর তাদের বদান্যতা ও দানশীলতার একটি বিশেষ দিক হল, তারা মেহমান দেখলে খুব খুশি হত। তাদের চেহারা হাস্যোজ্জ্বল হত এবং তারা তাদের মেহমানদের অভিবাদন জানাতে কোন প্রকার কার্পণ্য করত না।

আমর বিন আহতাম বলেন–

وضاحكته من قبل عرفانِ اسمه   يأنس إني للكسير رفيق .

মেহমানের নাম জানার আগেই তার চেহারা হত হাস্যোজ্জ্বল। তার সাথে এমনভাবে মিশে যেত যেন সে তার পুরাতন ও চেনা-জানা একজন সাথী।[৯]
তারা মেহমানদারি বিষয়ে তাদের সন্তানদের পর্যন্ত নসিহত করত।

---

[8] জাহিলিয়্যাত ও ইসলামের মাঝে আরবদের চরিত্র পৃ:৬৭ ড. মুহাম্মদ আন-নাছের।
[9] জাহিলিয়্যাত ও ইসলামের মাঝে আরবদের চরিত্র পৃ:২৭৪ ড. মুহাম্মদ আন-নাছের।

إن الأعز أبانا قال لنا أوصيكم بثلاث إنني تلف

الضيف أوصيكم بالضيف إن له حقا علي فأعطيه وأعترف .

আমাদের সম্মানিত পিতাগণ আমাদের বলতেন – আমি তো মারা যাচ্ছি ! আমি তোমাদের তিনটি বিষয়ে উপদেশ দিচ্ছি , এক. মেহমান ! আমি তোমাদের মেহমানের মেহমাদারির জন্য উপদেশ দিচ্ছি। কারণ, আমার উপর তাদের অধিকার রয়েছে। সুতরাং তোমরা তার মেহমানদারি করবে এবং স্বীকৃতি দিবে।[১০]

আরবরা দানশীলতার মত এমন এক উন্নত চরিত্র তারা সম্ভবত তাদের পিতা ইবরাহীম আলাইহিস সালাম হতেই পেয়েছেন। পরবর্তীতে তারা তাদের প্রকৃত মূল্য ও আসমানী দ্বীনকে ভুলে যায়, তখন তাদের এ চরিত্রটির কারণ ও মূলে এক ধরনের বিকৃতি ঘটে... ফলে তাদের দানশীলতা অপচয় ও প্রসংশা কুড়ানো ইত্যাদিতে রূপান্তরিত হয়। যেমন– পবিত্র কুরআনে ইবরাহীম আলাইহিস সালামের ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। একবার কিছু ফেরেশতা মানুষের আকৃতিতে তাঁর নিকট আসে, তিনি তাদের চিনতে পারেননি। তা সত্ত্বেও তিনি তাদের প্রয়োজন বা কি জন্য এসেছে সে সম্পর্কে কিছু জিজ্ঞেস করার আগেই পরিবারের নিকট চলে গেলেন এবং তাদের মেহমানদারির জন্য একটি (ভুনা) মোটা–তাজা গো–বাছুর এনে উপস্থিত করলেন।

আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿ فَرَاغَ إِلَىٰٓ أَهۡلِهِۦ فَجَآءَ بِعِجۡلٖ سَمِينٖ ٢٦ فَقَرَّبَهُۥٓ إِلَيۡهِمۡ قَالَ أَلَا تَأۡكُلُونَ ٢٧ فَأَوۡجَسَ مِنۡهُمۡ خِيفَةٗۖ قَالُواْ لَا تَخَفۡۖ وَبَشَّرُوهُ بِغُلَٰمٍ عَلِيمٖ ٢٨ ﴾ الذاريات: ٢٦ - ٢٨

অতঃপর সে দ্রুত চুপিসারে নিজ পরিবারবর্গের কাছে গেল এবং একটি মোটা–তাজা গো–বাছুর (ভাজা) নিয়ে আসল। অতঃপর সে তা তাদের সামনে পেশ করল এবং বলল, 'তোমরা কি খাবে না?' এতে তাদের সম্পর্কে সে মনে মনে ভীত হল। তারা বলল, 'ভয় পেয়োনা, তারা তাকে এক বিদ্বান পুত্র সন্তানের সুসংবাদ দিল'। (সূরা জারিয়াত : ২৬-২৮)

মোট কথা– দানশীলতা আরবদের একটি মৌলিক ও বিশেষ চরিত্র ছিল। যা বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে স্পষ্ট হত এবং বিভিন্ন মাধ্যমে তার বহি:প্রকাশ ঘটত। যেমন– সুন্দর আলোচনার সাথে সম্পৃক্ত হওয়া, নিজেরা নিজেদের প্রশংসা পছন্দ করা ইত্যাদি। এছাড়াও এটি ছিল তাদের নেতৃত্ব লাভের একটি মাধ্যম। ইত্যাদি কারণে তারা দান করাকে বেশি পছন্দ করতো।

তারপর যখন ইসলামের আগমন ঘটল, তখন ইসলাম এ মহান চরিত্রকে বহাল রাখল এবং দান করা ও জনকল্যাণ মূলক কাজে ব্যয় করার বিষয়ে ইসলাম আরো বেশি উৎসাহ দিল। তবে ইসলাম এখানে সামান্য সংস্কার করে কিছু শর্তারোপ করল যে, তা একমাত্র আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের সন্তুষ্টি লাভের লক্ষেই হতে হবে। এ মহান চরিত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের মাধ্যম হিসেবে পরিগণিত হবে এবং তা একটি গ্রহণযোগ্য ইবাদত বলে বিবেচিত হবে।

আল্লাহ তাআলা বলেন,

[10] জাহিলিয়্যাত ও ইসলামের মাঝে আরবদের চরিত্র পৃ:২৮৪ ড. মুহাম্মদ আন-নাছের।

﴿ وَيُطْعِمُونَ ٱلطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِۦ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا ۝٨ إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ ٱللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَآءً وَلَا شُكُورًا ۝٩ ﴾ الإنسان: ٨ - ٩

তারা খাদ্যের প্রতি আসক্তি থাকা সত্ত্বেও মিসকীন, ইয়াতীম ও বন্দীকে খাদ্য দান করে। তারা বলে, আমরাতো আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে তোমাদেরকে খাদ্য দান করি। আমরা তোমাদের থেকে কোন প্রতিদান চাই না এবং কোন শোকরও না। (সূরা আল ইনসান : ৮-৯)

আর যারা লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে দান খয়রাত করে কুরআন তাদের তিরস্কার করেছে এবং দান করার পর খোটা ও কষ্ট দেয়াকে আল- কুরআন সম্পূর্ণ নিষেধ করেছে। আল্লাহ বলেন−

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تُبْطِلُواْ صَدَقَٰتِكُم بِٱلْمَنِّ وَٱلْأَذَىٰ كَٱلَّذِى يُنفِقُ مَالَهُۥ رِئَآءَ ٱلنَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْءَاخِرِ ۖ فَمَثَلُهُۥ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُۥ وَابِلٌ فَتَرَكَهُۥ صَلْدًا ۖ لَّا يَقْدِرُونَ عَلَىٰ شَىْءٍ مِّمَّا كَسَبُواْ ۗ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْكَٰفِرِينَ ۝٢٦٤ ﴾ البقرة: ٢٦٤

হে মুমিনগণ, তোমরা খোঁটা ও কষ্ট দেয়ার মাধ্যমে তোমাদের সদকা বাতিল করো না। সে ব্যক্তির মত, যে তার সম্পদ ব্যয় করে লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে এবং বিশ্বাস করে না আল্লাহ ও শেষ দিনের প্রতি। অতএব তার উপমা এমন একটি মসৃণ পাথর, যার উপর রয়েছে মাটি। অতঃপর তাতে প্রবল বৃষ্টি পড়ল, ফলে তাকে একেবারে পরিষ্কার করে ফেলল। তারা যা অর্জন করেছে তার মাধ্যমে তারা কোন কিছু করার ক্ষমতা রাখে না। আর আল্লাহ কাফির জাতিকে হিদায়াত দেন না। (সূরা আল-বাকারা : ২৬৪)

মানুষের অন্তরের অবস্থার পরিচ্ছন্নতার ভিত্তিতেই নেকআমলসমূহ লিপিবদ্ধ হয়ে থাকে... আর ইখলাসের উষ্ণতা ধীরে ধীরে মানবত্মার মধ্যে প্রগাঢ়− বস্তুর প্রভাব, প্রসংশার আকাঙ্খা, ইজ্জত−সম্মান কুড়ানোর প্রতি আকর্ষণ, উচ্চাভিলাষ, অহংকারের মানসিকতা ও উন্নত জীবন−যাপনের মোহ ইত্যাদিকে দুর্বল করে ফেলে এবং মানবজাতির মানষিকতায় অলিক পরিবর্তন সাধন করে। কারণ, আল্লাহ তাআলা এমন আমলকেই পছন্দ করেন যা সব ধরনের ময়লা আবর্জনা হতে পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন হয়ে থাকে।

ইসলামী আকীদা বিশ্বাস মুসলমানদের জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে একটি অভাবনীয় পরিবর্তন সাধন করে। প্রথম প্রজন্মের মানুষের আত্মার এমন বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধিত হয়, তারা যেন নতুন প্রজন্ম হিসেবে নতুন ভাবেই পুনরায় জন্ম লাভ করে...এমনকি জাহিলিয়্যাতের অপসংস্কৃতি, কুসংস্কার, বেহায়াপনা ও অন্ধানুকরণ থেকে নিয়ে কোন কিছুর ছোঁয়াই যেন তাদের জীবনে আর অবশিষ্ট থাকেনি। তারা ইসলাম- তথা নিজেদের প্রতিক্ষিত ও পছন্দনীয় এক নতুন জীবনে আবির্ভূত হল এবং লাভ করল এক সুশীতল ছায়া ও আশ্রয়কেন্দ্র। তাদের সেই অবস্থা আর অবশিষ্ট থাকল না যে অবস্থা তারা জাহিলিয়্যাতের অন্ধ যুগে ছিল। তাদের জীবনের মৌলিকত্ব ও গতিবিধিতে সম্পূর্ণ পরিবর্তন পরিলক্ষিত হল। তাদের জীবনের চিত্রটিই পাল্টে গেল, যেন তারা ইসলামের ছায়াতলে একত্র হয়ে এক নতুন জীবন লাভ করল।

ইসলাম তাদেরকে ব্যয় ও দান−খয়রাত করার প্রতি উৎসাহিত করল, তবে অপচয় ও অযথা ব্যয় করা হতে নিষেধ করল। আল্লাহ তাআলা বলেন−

﴿ وَءَاتِ ذَا ٱلْقُرْبَىٰ حَقَّهُۥ وَٱلْمِسْكِينَ وَٱبْنَ ٱلسَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا ۝٢٦ ﴾ الإسراء: ٢٦.

আর আত্মীয়কে তার হক দিয়ে দাও এবং মিসকীন ও মুসাফিরকেও। আর কোনভাবেই অপব্যয় করো না। (সূরা আল−ইসরা: ২৬)

অনুরূপভাবে ইসলাম কৃপণতা ও ধন−সম্পদ গচ্ছিত করে রাখাকে নিরুৎসাহিত করে এবং এক প্রকার ঘৃণা হিসেবে দেখে। আল্লাহ তাআলা বলেন−

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِنَّ كَثِيرٗا مِّنَ ٱلۡأَحۡبَارِ وَٱلرُّهۡبَانِ لَيَأۡكُلُونَ أَمۡوَٰلَ ٱلنَّاسِ بِٱلۡبَٰطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِۗ وَٱلَّذِينَ يَكۡنِزُونَ ٱلذَّهَبَ وَٱلۡفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَبَشِّرۡهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٖ ﴿٣٤﴾ ﴾ التوبة: ٣٤

হে ঈমানদারগণ, নিশ্চয় পণ্ডিত ও সংসার বিরাগীদের অনেকেই মানুষের ধন-সম্পদ অন্যায়ভাবে ভক্ষণ করে, আর তারা আল্লাহর পথে বাধা দেয় এবং যারা সোনা ও রূপা পুঞ্জীভূত করে রাখে, আর তা আল্লাহর রাস্তায় খরচ করে না, তুমি তাদের বেদনাদায়ক আযাবের সুসংবাদ দাও। (সূরা তাওবা : ৩৪)
ইসলামের দৃষ্টিতে মানুষের ধন–সম্পদ, মাল-আসবাব পার্থিব জগতের জীবনোপকরণ ও মাধ্যম মাত্র, তা দ্বারা মানুষ তাদের মৌলিক ও প্রয়োজনীয় চাহিদা পূরণ করবে। দুনিয়ার এসব ধন সম্পদকে তারা তাদের জীবনের একমাত্র লক্ষ্য এবং শেষ গন্তব্য হিসেবে বিবেচনা করা কোন ক্রমেই উচিত নয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন–

" يقول ابن آدم مالي مالي ، وهل لك يابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت ، أو لبست فأبليت ، أو تصدقت فأمضيت "[11].

আদম সন্তান বলে থাকে, আমার সম্পদ আমার সম্পদ ...। মূলত: হে আদম সন্তান, তোমার সম্পদ বলতে তা-ই যা তুমি খেয়ে নি:শেষ করেছ, পরিধান করে নষ্ট করছ অথবা দান–খয়রাত করে অতিবাহিত করেছ, (তা ছাড়া তোমার আর কোন সম্পদ আছে কি) ?
ইসলাম মেহমানের মেহমাদারী করাকে ওয়াজিব করেছে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন-

.." ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه "[12] ،

আর তোমাদের মধ্যে যে আল্লাহ ও আখেরাত দিবসের প্রতি ঈমান রাখে সে যেন তার মেহমানের মেহমানদারী করে।
তবে এ মহান দ্বীন–ইসলাম মেহমাদারীর যে নিয়ম আমাদের শিখিয়েছেন তা হল, আমরা যেন বাড়ীর মালিক তথা মেজবানের অবস্থার প্রতি বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখি। আমরা কখনোই তাকে সংকট বা অস্বস্তিত নিপতিত করব না। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন-

" الضيافة ثلاثة أيام . وجائزته يوم وليلة . ولا يحل لرجل مسلم أن يقيم عند أخيه حتى يؤثمه . قالوا : يا رسول الله ! وكيف يؤثمه ؟ قال : يقيم عنده ، ولا شيء يقريه به"[13] ،

মেহমানদারী সাধারণত তিনদিন। তবে উত্তম হল একদিন একরাত। কোন মুসলমানের জন্য তার ভাইয়ের নিকট এত সময় অবস্থান করা উচিত না যাতে সে তাকে অসহায় (গোনাহগার) বানিয়ে ফেলে! তারা বলল , হে রাসূল তা কীভাবে হবে? নবীজী বললেন, সে তার নিকট অবস্থান করতেই থাকবে, অথচ তার সামনে দেয়ার মত কিছুই তার নিকট থাকবে না। (বর্ণনায় সহিহ মুসলিম)

11- رواه مسلم ، كتاب الزهد والرقائق ، ح/ ٥٢٥٨.

12- رواه البخاري ، كتاب الأدب ، ح/ ٥٦٧١.

13- رواه مسلم ، كتاب اللقطة ، ح/ ٣٢٥٦.

এ দ্বীনের শিক্ষা ব্যবস্থায় দানশীলতা ও বদান্যতাকে দান-খরচ করার দিক দিয়ে একটি বাস্তবসম্মত ও উন্নত অবস্থায় রূপান্তরিত করে, যাতে কোন লোক দান করার ফলে দরিদ্র বা অভাবী হয়ে পড়ার আশঙ্কা না থাকে। আর তা এ জন্য যে, তাদের অন্তরে দুনিয়া একেবারেই নগণ্য হয়ে যাওয়াতে তাদের সভ্যতা ও সম্মানের দিক মানবতার সুউচ্চ শিখরে উন্নিত করে। আর এ দানশীলতা ও বদান্যতার দৃষ্টান্ত হিসেবে আল্লাহ তাআলা তার বান্দাদের থেকে বিশেষ লোক যেমন– নবী ও সিদ্দিকীনদের নির্বাচিত করেন। ইবরাহীম আ. এর মেহমানদারীর ঘটনায় বর্ণিত,

" لما قرب إليهم العجل قالوا : إنا لا نأكل طعاما إلا بثمنه . قال إبراهيم : إنه له ثمناً . قالوا : وما ثمنه ؟ قال : تذكرون اسم الله على أوله ، وتحمدونه على آخره . قال فنظر جبريل إلى ميكائيل :فقال: حقٌ لهذا أن يتخذه ربه خليلاً " .

তিনি যখন তাদের দিকে ভূনা গো বাচুর এগিয়ে দিলেন, তখন তারা বলল, আমরা বিনিময় ছাড়া তোমার থেকে কোন খাদ্য গ্রহণ করব না। তখন ইবরাহীম বললেন, অবশ্যই খাদ্যের একটি মূল্য আছে। তখন তারা বলল, তার মূল্য কি? তিনি বললেন, তোমরা তোমাদের খাওয়ার শুরুতে আল্লাহর নাম নেবে এবং খাওয়ার শেষে আল্লাহর প্রশংসা করবে। তিনি বলেন, এ কথা শোনে জিবরিল মিকাঈলের দিকে তাকিয়ে বলল, তার প্রভু তাকে বন্ধু রূপে গ্রহণ করা যথাযথ। এ উপযুক্ততা তার আছে।[১৪]।
এ ছাড়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, তিনিতো প্রবাহিত প্রবল বাতাসের ছেয়েও অধিক দানশীল ছিলেন। ইবনে আব্বাস রা. বলেন–

كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير

রাসূল সমগ্র মানুষ হতে সর্বাধিক দানশীল ছিলেন...

، فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة "

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রবাহিত প্রবল বাতাস হতেও বেশি দানশীল ছিলেন[১৫]। আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দান–খয়রাত, ব্যয় করা এবং পরিচিত ও অপরিচিত লোকদের আপ্যায়ন করানোর প্রতি বিশেষভাবে মনোযোগী ছিলেন। লোকদেরকেও সেদিকে উৎসাহিত করতেন। এক লোক তাকে জিজ্ঞাসা করেছিল–

" أي الإسلام خير ؟ قال : تطعم الطعام ، وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف "[١٦].

কোন ইসলাম উত্তম ? তার উত্তরে তিনি বলেন– খাবার খাওয়ানো ও তোমার পরিচিত ও অপরিচিত সকলকে সালাম দেওয়া। (সহিহ বুখারী)
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর এ দানশীলতা ও তার নির্দেশনাবলীর প্রভাবে সাহাবীদের অবস্থা এমন ছিল যে, তারা আল্লাহর সন্তষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে মাতা–পিতা, নিকটাত্মীয়, প্রতিবেশী ও সমগ্র মানুষের জন্য খরচ করার প্রতিযোগিতায় আবর্তিত হন।

---

[১৪] জাহিলিয়্যাত ও ইসলামের মাঝে আরবদের চরিত্র পৃ:৮৮ ড. মুহাম্মদ আন-নাছের।
[১৫] বুখারী কিতাবুল মানাকেব পৃষ্টা ৩২৯

16- رواه البخاري ، كتاب الاستئذان ، ح/ ٥٧٦٧ .

فعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما أن نتصدق ، فوافق ذلك مالا عندي ، فقلت : اليوم أسبق أبا بكر إن سبقته يوما، فجئت بنصف مالي ! فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم :" ما أبقيت لأهلك ؟ " قلت : مثله . وأتى أبو بكر رضي الله عنه بكل ما عنده !! فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم:" ما أبقيت لأهلك ؟ " قال : أبقيت لهم الله ورسوله ! قلت : لا أسابقك إلى شيء أبدا[١٧]

ওমর ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের সদকা করার জন্য আদেশ দিলেন। এ সময় আমার নিকট কিছু সম্পদ ছিল। তখন আমি মনে মনে বললাম, আজ আমি আবু বকর এর উপর বিজয় লাভ করব যদিও তা ইতিপূর্বে কখনো আমি পারিনি এবং আমি আমার সম্পদের অর্ধেক নিয়ে রাসূলুল্লাহর দরবারে উপস্থিত হই। তখন রাসূল আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি তোমার পরিবারের জন্য কি রেখে এসেছ? বললাম – এর সমপরিমাণ সম্পদ রেখে এসেছি! এ দিকে আবু বকর রা. তার নিকট যা ছিল সব কিছু নিয়ে রাসূলের দরবারে উপস্থিত হলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি তোমরা পরিবারের জন্য কি রেখে এসেছ ? উত্তরে তিনি বললেন, আমি তাদের জন্য আল্লাহ ও তার রাসূলকে রেখে এসেছি ! তখন আমি বললাম, আমি কখনোই আর আপনার সাথে প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হব না। (আবু দাউদ)
এ উম্মত একেবারে সংকীর্ণ ও অসচ্ছল অবস্থায়ও দান খয়রাত করা এবং দানশীলতাকে পছন্দ করার দিক দিয়ে এক অনন্য বৈশিষ্ট্যের অধিকারী এবং ইতিহাস সৃষ্টিকারী। আনসার সাহাবীগণ দান-খয়রাত করার দিক দিয়ে এমন এক পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছিল যে, তারা তাদের নিজদের জীবনের উপর অন্যদের প্রাধান্য দেয়া এবং অপরের অধিকারকে সমুন্নত রাখাকে অধিক পছন্দ করতেন। আর এটা ছিল দানশীলতার এক উৎকৃষ্ট ও চূড়ান্ত উদাহরণ, যার দৃষ্টান্ত ইতিহাসে নেই। তাদের এ দৃষ্টান্ত স্থাপনকে আল্লাহ তাআলা কুরআনে বিশেষ প্রসংশার সাথে উল্লেখ করেছেন। আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿ وَٱلَّذِينَ تَبَوَّءُو ٱلدَّارَ وَٱلْإِيمَٰنَ مِن قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِى صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّآ أُوتُوا۟ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰٓ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ ۚ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِۦ فَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴿٩﴾ ﴾ الحشر: ٩

আর মুহাজিরদের আগমনের পূর্বে যারা মদীনাকে নিবাস হিসেবে গ্রহণ করেছিল এবং ঈমান এনেছিল (তাদের জন্যও এ সম্পদে অংশ রয়েছে), আর যারা তাদের কাছে হিজরত করে এসেছে তাদেরকে তারা ভালবাসে। আর মুহাজরিদেরকে যা প্রদান করা হয়েছে তার জন্য এরা তাদের অন্তরে কোন ঈর্ষা অনুভব করে না। এবং নিজেদের অভাব থাকা সত্ত্বেও নিজেদের ওপর তাদেরকে অগ্রাধিকার দেয়। যাদের মনের কার্পণ্য থেকে রক্ষা করা হয়েছে, তারাই সফলকাম। (সূরা হাশর : ৯)
এর একটি উদাহরণ হল, এক ক্ষুধার্ত লোক রাসূলুল্লাহর দরবারে এসে মেহমানদারী করানোর প্রার্থনা জানালো। নবীজী তার স্ত্রীদের নিকট তার জন্য খেতে দেয়ার মত কিছু তালাশ করে না পেয়ে সাহাবীদের নিকট মেহমানদারী করাতে আগ্রহী কেউ আছে কিনা জানতে চাইলেন। তখন একজন আনসারী সাহাবী

17- رواه أبو داود ، كتاب الزكاة ، ح/ ١٤٢٩، وحسنه الألباني .

তাকে মেহমান হিসেবে গ্রহণ করল। কিন্তু তার অবস্থা ছিল এমন যে, সে রাতে তার ঘরে এক মাত্র তার বাচ্চার রাতের খাবার ছাড়া আর কিছুই ছিল না। তখন সে তার স্ত্রীকে রাসূলুল্লাহর মেহমানের মেহমানদারী করার কথা বলে ঘরে খাবার আছে কিনা জানতে চাইল। স্ত্রী বলল কেবল বাচ্চাদের খাবার আছে। তখসে বলল, বাচ্চাদের ঘুম পাড়িয়ে দাও এবং মেহমানের খাবারের আয়োজন কর। স্ত্রী খাবার মেহমানের সামনে পেশ করল এবং সেই সাহাবী তার সাথে বসল। এদিকে স্ত্রী চেরাগটি নিভিয়ে দিল। তারা উভয়ে দেখাচ্ছিল যে, তারাও খাচ্ছে ! কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তারা উপবাস রাত যাপন করল। সকালে ঘুম থেকে উঠে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর দরবারে গেলে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন−

: ((ضحك الله الليلة – أو عجب – من فعالكما)) .

তোমাদের কাজ দেখে মহান আল্লাহ রাতে হেঁসেছেন, বা বিস্মিত হয়েছেন।

فأنزل الله قوله تعالى : ﴿ وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ ﴾[١٨].

অত:পর আয়াত নাযিল করলেন, এবং নিজেদের অভাব থাকা সত্ত্বেও নিজেদের উপর অপরকে অগ্রাধিকার দেয়। (সহিহ বুখারী)

ইসলাম প্রতিটি কাজে মধ্যপন্থা অবলম্বন করার প্রতি আহবান করে। সুতরাং দানশীলতারও একটি সীমারেখা ও উত্তম দিক রয়েছে, তা কোন ক্রমেই লঙ্ঘন করা উচিত নয়, যখন কেউ এ সীমা অতিক্রম করে, তখন তা অপচয়ে পরিণত হয়। আর যখন নির্দিষ্ট সীমা হতে আরো বেশি সংকোচন করা হবে, তখন তা হবে কৃপণতা ও ব্যয়কুণ্ঠতা। ، [19]

অপর দিকে ইসলাম কৃপণতা ও ব্যয়কুন্ঠতা হতে সতর্ক করে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন−

" ... واتقوا الشح ؛ فإن الشح أهلك من كان قبلكم ، حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم"[٢٠] ،

আর তোমরা কৃপণতা হতে বিরত থাক; কারণ, কৃপণতাই তোমাদের পূর্ববর্তী লোকদের ধ্বংস করেছে। তা তাদেরকে পারস্পরিক রক্তপাত করতে এবং তাদের ইজ্জত সম্মান হরণ করতে উৎসাহিত করেছিল। আব্দুর রহমান ইবনে আউফ রা. আল্লাহর নিকট প্রার্থণা করেন−

" اللَّهُمَّ قني شح نفسي ، فقال له رجل : ما أكثر ما تدعو بهذا ! فقال: إذا وقيت شح نفسي ، وقيت الشح والظلم والقطيعة " [٢١].

18- البخاري ، كتاب المناقب ، باب قول الله ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة (ح /٣٥٨٧) ، الآية في سورة الحشر :٩ ، انظر

بحث : حياة الأنصار.

19- أخلاق العرب بين الجاهلية والإسلام ص٩٨ ، د. محمد الناصر.

20- رواه مسلم ، كتاب البر والصلة ، ح/ ٤٦٧٥.

21- أخلاق العرب بين الجاهلية والإسلام ص٩٨ ، د. محمد الناصر.

হে আল্লাহ তুমি আমাকে আমার অন্তরের কৃপণতা হতে হেফাজত কর। এ কথা বললে তাকে এক লোক বলল, এ দোয়াটি তুমি খুবই বেশি বেশি কর! তখন তিনি বললেন, যদি আমি আমার আত্মার কার্পণ্য হতে রক্ষা পেয়ে যাই তাহলে যুলম-অত্যাচার, আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নতা ও কার্পণ্য হতে নিরাপদ থাকবো।
ইসলামের প্রভাবের কারণে এভাবেই আরবদের জীবনে একটি বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটে। ইসলাম তাদের চরিত্রকে সংশোধন করে এবং তাদের জীবনকে সভ্যতা ও উন্নতির চরম শিখরে পৌঁছেদেয়।

আরবদের বীরত্ব ও সাহসিকতা:
আরবরা যে সব গুণে গুণান্বিত ছিলেন তার অন্যতম হল তাদের বীরত্ব ও সাহসিকতা। তাদের বীরত্ব ও সাহসিকতা ছিল বিশ্ব সেরা। তাদের বীরত্বের সামনে সমগ্র দুনিয়া ছিল অসহায় প্রায়। বিষয়টি আরো অধিক স্পষ্ট করার নিমিত্তে বলবো... তোমরা আরবদের বীরত্ব ও সাহসিকতার দিকে একটু গভীরভাবে লক্ষ্য করে দেখ... বীরত্ব ও সাহসিকতা তাদের নিকট অতি পছন্দনীয় ও প্রিয় হওয়া এবং তদ্বারা গৌরব–অহংকার করা ইত্যাদি দিক বিবেচনা করলে, আমরা দেখতে পাই যে, তাদের বীরত্ব তাদের দানশীলতা হতে কোন অংশেই কম ছিল না। বরং তাদের নিকট তাও ছিল গৌরবযোগ্য ও অত্যধিক পছন্দনীয় একটি বিশেষ গুণ। সাহসিকতা ও বীরত্ব তখনই প্রমাণিত হয় যখন কেউ সংকটাপন্ন ও বিপদ সঙ্কুল মুহূর্তে নিজকে এগিয়ে দেয় এবং কোন প্রকার পিছপা না হয়। সুতরাং, মনে রাখতে হবে বীরত্ব ও সাহসিকতা বিপদ, সংকট ও জীবন-মৃত্যুর কোন পরওয়া না করার সাথে সম্পৃক্ত।...আরবরা সব সময় বীরত্বকে পছন্দ করত এবং লড়াই করে মরতে পছন্দ করত। তাই তারা লড়াই করে মরার প্রশংসা এবং বিছানায় কাতরিয়ে মরার দূর্ণাম করে বেড়াতো। কেউ যদি কোন কারণে বিছানায় কাতরিয়ে মারা যেত, তারা তাকে অপমান সূচক বলত: অমুক লোক স্বীয় নাকের আঘাতে মারা গেছে।
আর সামুয়াল বলেন– আমাদের কোন সরদারই যুদ্ধের ময়দানে মুখথুবড়ে মারা যায়নি কিংবা ধ্বংস হয়নি। তরবারির আঘাতেই আমাদের খুন প্রবাহিত হত। তরবারির আঘাত ছাড়া আমাদের কখনো মৃত্যু হত না।
মোট কথা, সাহসিকতা ও বীরত্ব ছিল আরবদের গৌরবোজ্জল ঐতিহ্য। গোত্রীয় লোকদের সাহায্য এবং তাদের ইজ্জত সম্মান রক্ষা করা ছিল আরবদের অনন্য নৈতিক দায়িত্ব। তাই তারা কখনো মৃত্যুকে পরোয়া করত না। তারা তাদের স্বগোত্রীয় লোকদের হেফাজত ও তাদের ইজ্জত সম্মানকে সমুন্নত রাখতে তাদের অন্তরে বীরত্ব, সাহসীকতা ও বাহাদুরী লালন করত। মরু অধিবাসীরা তাদের সন্তানদের অন্তরে সাহসিকতা, বাহাদুরী ও অহংকারীর বীজ বোপন করে যেত একেবারে ছোট বেলা হতেই। আরবদের যুদ্ধ, বিবাদ, মারামারি, কাটাকাটি ও হানাহানিতে ভরা উশৃংখল জীবন তাদের বাধ্য করত তাদের বাচ্চাদের অন্তরেও সাহসিকতা ও বাহাদুরী লালন করতে। কারণ, এ ছাড়া তাদের নিকট আর কোন বিকল্প পথ ছিল না। সমাজে মাথা উঁচু করে বাঁচার জন্য তাদের নিকট এর কোন বিকল্প ছিল না। ইচ্ছায়-অনিচ্ছায় যেভাবেই হোক লড়াই করেই তাদের বাঁচতে হত। ফলে দেখা যেত, তাদের অন্ধ ও অযৌক্তিক বীরত্ব ও সাহসিকতা বিভিন্নভাবে প্রকাশ পেত; কোন প্রকার কারণ ছাড়াই যুদ্ধ বিগ্রহে লিপ্ত হয়ে নিজেদের বীরত্ব দেখাতো; এর জন্য তাদের বাধ্যবাদকতা বা কোন নিয়ম-কানুন ছিল না।
জনৈক মালেক বিন মিসমা সম্পর্কে বর্ণিত আছে, কোন কারণে মালিক বিক্ষুব্ধ হলে তার সাথে এক হাজার তলোয়ার গর্জে উঠতো! তারা কখনোই তার কারণ কি তা অনুসন্ধান করত না এবং জিজ্ঞাসা করত না যে, কেন তোমরা আমার সাথে ক্ষুব্ধ হলে? !!

তার পর যখন ইসলামের আবির্ভাব হল, ইসলাম তাদের সমগ্র মতামতকে একত্র করল, তাদের অন্ধ অনুকরণ ও নীতি বিবর্জিত জাতীয়তার উপর প্রতিষ্ঠিত অযৌক্তিক বীরত্ব, বাহাদুরী প্রদর্শন ও শক্তি প্রয়োগ করাকে নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসে এবং তার সঠিক প্রয়োগ ক্ষেত্র কি হবে? তা নিরুপণ করে দেয়। যেমনটি কুরআন তার স্বভাব সুলভভঙ্গিতে বর্ণনা করে–

﴿ إِذْ جَعَلَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ فِى قُلُوبِهِمُ ٱلْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ ٱلْجَٰهِلِيَّةِ فَأَنزَلَ ٱللَّهُ سَكِينَتَهُۥ عَلَىٰ رَسُولِهِۦ وَعَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ ٱلتَّقْوَىٰ وَكَانُوٓا۟ أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيمًا ﴿٢٦﴾ ﴾ الفتح: ٢٦

যখন কাফিররা তাদের অন্তরে আত্ম–অহমিকা পোষণ করেছিল, জাহিলী যুগের আহমিকা। তখন আল্লাহ তাঁর রাসূলের উপর ও মুমিনদের উপর স্বীয় প্রশান্তি নাযিল করলেন এবং তাকওয়ার বাণী তাদের জন্য অপরিহার্য করলেন, আর তারাই ছিল এর সর্বাধিক উপযুক্ত ও এর অধিকারী। আর আল্লাহ হলেন প্রত্যেক বিষয়ে সর্বজ্ঞ। (সূরা ফাতহ : ২৬)

ইসলামই মানুষকে সত্যিকার সাহসিকতা ও বাহাদুরী শিখিয়েছে। ইসলাম মানবজাতিকে যে বীরত্ব ও বাহাদুরী প্রর্দশনের প্রতি আহ্বান করে, তাই হল প্রকৃত বাহাদুরী ও সত্যিকার সাহসিকতা। সাহসিকতা দেখানো সাধারণত সত্যের পক্ষে এবং বাতিলের বিপক্ষে হতে হবে। সত্যের পক্ষে ও বাতিলের বিপক্ষে লড়াই করাকে ইসলাম উৎসাহিত করেছে। প্রকৃত ও খালেস জিহাদ–লড়াই হল, যে জিহাদ বা লড়াই একমাত্র আল্লাহর জন্য হয় এবং তাতে সুনাম হয় তাও যেন আল্লাহর জন্য হয় আর যদি বদনাম হয় তাও যেন আল্লাহর জন্যই হয়। মানুষকে দেখানো এবং মানুষের থেকে প্রসংশা কুড়ানোর জন্য নয়। আরবদের মধ্যে মানুষের প্রসংশা এবং তাদের দেখিয়ে দেয়ার মানসিকতা ছিল প্রভল। তাই ইসলাম আরবদের মধ্যে বদ্ধমূল সে জাহিলিয়্যাতকে পরিবর্তন করে দিল এমন এক যুগে, যে যুগে কেবল এক লোকের তলোয়ারের উত্তোলনের কারণে হাজার হাজার তলোয়ার উত্তোলিত হত, অথচ তারা জানতো না যে, কী কারণে বিক্ষুব্ধ হল, কী কারণে তারা তাদের তলোয়ার উত্তোলন করল? তাদেরকে কেউ জিজ্ঞাসাও করত না যে কী কারণে তুমি এভাবে ফুঁসে উঠছ এবং তোমার উদ্দেশ্যই বা কি?। [২২]

মনে রাখতে হবে, ইসলামে সাহসিকতা ও বীরত্বের একটি সীমারেখা আছে। কেউ যদি তা অতিক্রম করে যায় তবে তা হবে অতিরঞ্জন বা বাড়াবাড়ি ও অনর্থক বিষয়ে ঝাপিয়ে পড়া, যা জাহিলিয়্যাত বৈ কিছু নয়। আর নির্ধারিত সীমা হতে কম হলে তাও হবে এক প্রকার দুর্বলতা ও কাপুরুষতা। ইসলামের বিধান হল, বাহাদুরী শুধু প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করাতে সীমাবদ্ধ নয় বরং প্রকৃত বাহাদুর ও সাহসী হল সে ব্যক্তি, যে ক্রোধের সময় নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে, পারে ক্রোধকে সংবরণ করতে। ব্যক্তিগত বিষয়ে সে ক্ষমা করাকে বেশি প্রাধান্য দেয়। জাহিলিয়্যাতের যুগে অনর্থক উত্তেজিত হওয়া ও অকারণে ক্ষুব্ধ হওয়ার যে প্রবণতা ছিল, তা লাঘব করা, তারা কীভাবে নিজদের নিয়ন্ত্রণ করবে তা শিখানো এবং পারস্পরিক বিরোধ কমিয়ে আনার জন্যই ইসলামের আগমণ। ইসলাম তাদের এ ধরনের সাহসিকতাকে সত্য প্রতিষ্ঠা, অন্যায়-অবিচার ও যুলুম-অত্যাচার প্রতিহত করে ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা করার কাজে ব্যয় করতে কাজে লাগায়। বরং শুধু তা-ই নয়! জাহিলিয়্যাতের যুগে তাদের শক্তিকে অনৈতিক যুদ্ধ, কুস্তি, প্রতিযোগিতা ও রেশারেশিতে ব্যয় করার পরিবর্তে তারা যেন তাদের সাহস ও বীরত্বকে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করার মাধ্যমে আল্লাহর দ্বীনের দুশমনদের চিরতরে খতম করার কাজে ব্যয় করে সে দিকে তাদের উদ্বুদ্ধ করে। একজন মুসলমান আল্লাহর রাস্তায় আল্লাহর কালিমাকে সমুন্নত রাখতেই জিহাদ করবে এটাই হল তার জীবনের যাবতীয় লক্ষ্যের অন্যতম।

[২২] ইসলাম ও জাহিলিয়্যাতের মাঝে আরবদের চরিত্র। ড. মুহাম্মদ আন-নাছির, ১০৪

﴿ إِنَّ ٱللَّهَ ٱشۡتَرَىٰ مِنَ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ أَنفُسَهُمۡ وَأَمۡوَٰلَهُم بِأَنَّ لَهُمُ ٱلۡجَنَّةَۚ يُقَٰتِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَيَقۡتُلُونَ وَيُقۡتَلُونَۖ وَعۡدًا عَلَيۡهِ حَقّٗا فِي ٱلتَّوۡرَىٰةِ وَٱلۡإِنجِيلِ وَٱلۡقُرۡءَانِۚ وَمَنۡ أَوۡفَىٰ بِعَهۡدِهِۦ مِنَ ٱللَّهِۚ فَٱسۡتَبۡشِرُواْ بِبَيۡعِكُمُ ٱلَّذِي بَايَعۡتُم بِهِۦۚ وَذَٰلِكَ هُوَ ٱلۡفَوۡزُ ٱلۡعَظِيمُ ١١١ ﴾ التوبة: ١١١

নিশ্চয় আল্লাহ মুমিনদের থেকে তাদের জান ও মাল ক্রয় করে নিয়েছেন (এর বিনিময়ে) যে, তাদের জন্য রয়েছে জান্নাত। তারা আল্লাহর পথে লড়াই করে। অতএব তারা মারে ও মরে। তাওরাত, ইঞ্জিল ও কুরআনে এ সম্পর্কে সত্য ওয়াদা রয়েছে। আর নিজ ওয়াদা পূরণে আল্লাহর চেয়ে অধিক কে হতে পারে? সুতরাং তোমরা (আল্লাহর সংগে) যে সওদা করেছ, সে সওদার জন্য আনন্দিত হও এবং সেটাই মহাসাফল্য। (সূরা তাওবা: ১১১)

﴿ وَمَا لَكُمۡ لَا تُقَٰتِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلۡمُسۡتَضۡعَفِينَ مِنَ ٱلرِّجَالِ وَٱلنِّسَآءِ وَٱلۡوِلۡدَٰنِ ٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَآ أَخۡرِجۡنَا مِنۡ هَٰذِهِ ٱلۡقَرۡيَةِ ٱلظَّالِمِ أَهۡلُهَا وَٱجۡعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيّٗا وَٱجۡعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا ٧٥ ﴾ النساء: ٧٥

আর তোমাদের কী হল যে, তোমরা আল্লাহর রাস্তায় লড়াই করছ না! অথচ দুর্বল পুরুষ, নারী ও শিশুরা বলছে, ‘হে আমাদের রব, আমাদেরকে বের করুন এ জনপদ থেকে’ যার অধিবাসীরা যালিম এবং আমাদের জন্য আপনার পক্ষ থেকে একজন অভিভাবক নির্ধারণ করুন। আর নির্ধারণ করুন আপনার পক্ষ থেকে একজন সাহায্যকারী। (সূরা নিসা: ৭৫)

ইসলামের আদর্শ হল, একজন শক্তিশালী–সাহসী মুমিন আল্লাহ তাআলার নিকট একজন্য দুর্বল ও ভীত মুমিন হতে অধিক প্রিয়। তবে তাদের প্রত্যেকের মধ্যেই কল্যাণ নিহিত। (মুসলিম: কিতাবুল কাদার, হাদীস নং ৪৮১৬)

তবে, বীরত্ব ও সাহস যদি অহংকারের জন্য হয়, তা কখনোই কল্যাণ বয়ে আনে না এবং ইসলাম তা পছন্দও করে না। সাহস ও শক্তি দিয়ে সীমালজ্ঘন করা এবং মানুষকে হেয়প্রতিপন্ন করাকে ইসলাম কখনোই বৈধতা দেয় না। ইসলাম শুধু তখনই বৈধতা দেয়, যখন তা সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করা কিংবা যে অন্যায়কে প্রতিহত ও মিটিয়ে দেয়ার জন্য আল্লাহ তাআলা নির্দেশ দিয়েছেন তা প্রতিহত করা বা মিটিয়ে দেয়ার কাজে লাগানো হয় থাকে।

জাহিলিয়্যাতের যুগের অনৈতিক বীরত্ব ও সাহসিকতা এবং বৈধ ও শরীয়তসম্মত বীরত্বের মাঝে প্রার্থক্য এ জায়গায়ই, যে বীরত্বের সম্পর্ক সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করা এবং ইনসাফ ও কল্যাণ প্রসার করা হয়ে থাকে সে বীরত্বকেই ইসলামী শরীয়তের মানদন্ডে সঠিক বীরত্ব ও বাস্তবিক কল্যাণ রূপে মূল্যায়ন করা হবে। কোন বীরের নিকট পরাজয় অথবা কোন বিবেক–বুদ্ধিহীন লোকের অনৈতিক বীরত্ব প্রদর্শনকে শরীয়ত স্বীকৃতি দেয়না।[23]

আল্লাহ তাআলা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বাতিলকে বাতিল দ্বারা, সীমালজ্ঘনকে সীমালঙঘন দ্বারা প্রতিহত করতে এবং কোন বস্তুকে একস্থানে হারাম অন্য স্থানে হালাল বলতে পাঠাননি। তাছাড়া আল্লাহ তাকে কোন উম্মতের নোংরামীকে অপর জাতির নোংরামী দ্বারা সংস্কার করতেও দুনিয়াতে পাঠাননি। আল্লাহ তাআলা তাকে তথাকথিত নেতা, রাজনৈতিক গুপ্তচর ও যেনতেন দায়িত্বশীল বানিয়ে পাঠাননি। এ জন্যও পাঠানো হয়নি যে, সে আগুনের লাগাম টেনে ধরবে, মশককে তার নিজের দিকে এগিয়ে নিবে। এবং তাকে এ জন্যও পাঠানো হয়নি যে তিনি মানুষদের পারস্য ও রোমানদের

[23] ইসলাম ও জাহিলিয়্যাতের মাঝে আরবদের চরিত্র। ড. মুহাম্মদ আন-নাছির, ১১২

গোলামী হতে আদনান ও কাহতানদের গোলামীর দিকে নিয়ে আসবে। বরং, আল্লাহ তাকে সমগ্র মানুষের নিকট সুসংবাদ দাতা ও ভয় প্রদর্শনকারী হিসেবে পাঠিয়েছেন। আল্লাহর দিকে তাঁরই অনুমতিক্রমে আহ্বানকারী, আলোর মশাল ও আলোকবর্তিকা হিসেবে প্রেরণ করেছেন। এ ছাড়া আল্লাহ তাকে সমগ্র মানবতাকে বান্দার ইবাদত থেকে বের করে এক আল্লাহর ইবাদতের দিকে ধাবিত করতে প্রেরণ করেছেন। কুরআনের মাধ্যমে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের আত্মার খোরাক জোগাতেন এবং ঈমানের মাধ্যমে তাদের অন্তর লালন–পালন করতেন। জ্ঞানের উপস্থিতি, বিনয়াবনত দেহ , একাগ্র মন নিয়ে পূত-পবিত্র হয়ে দৈনিক পাঁচবার আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের নিকট তাদের অবনত হতে শিখাতেন। ফলে প্রতিদিনই বৃদ্ধি পেত তাদের আত্মার সম্মান, অন্তরের পরিচ্ছন্নতা, চরিত্রের উন্নতি এবং জাগতিক ক্ষমতার গোলাম হতে মুক্ত হওয়া ও প্রবৃত্তির চাহিদা মোকাবেল করার ক্ষমতা। এবং আসমান ও যমীনের প্রতিপালকের দিকে ছুটে যাওয়ার আকর্ষণ। তিনি তাদের অনুশীলন করাতেন কষ্টের উপর ধৈর্য্য ধারনের, সুন্দর ক্ষমা ও মানবাত্মাকে নিয়ন্ত্রনের বিষয়ে।
তাদের অন্তরে যুদ্ধের প্রতি ভালোবাসা এত প্রগাড় ছিল যে, যেন তারা তলোয়ার নিয়েই জন্ম গ্রহণ করেন। তারা এমন এক জাতি তাদের জন্ম লগ্ন থেকেই তারা সুস দাহেস ও গাবারাদের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত। এ ছাড়া ইয়ামুল ফিজার তাদের থেকে অনেক দূরে নয়। বরং তাও একেবারেই কাছে। তবে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বৈপ্লবিক চেতনাকে নিয়ন্ত্রণ করার তালীম দেন এবং তাদের আরব্য স্বভাবকে সংশোধন করেন। তিনি তাদের বলেন–

﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوٓاْ أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكَوٰةَ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ ٱلْقِتَالُ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَخْشَوْنَ ٱلنَّاسَ كَخَشْيَةِ ٱللَّهِ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً ۚ وَقَالُواْ رَبَّنَا لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا ٱلْقِتَالَ لَوْلَآ أَخَّرْتَنَآ إِلَىٰٓ أَجَلٍ قَرِيبٍ ۗ قُلْ مَتَٰعُ ٱلدُّنْيَا قَلِيلٌ وَٱلْءَاخِرَةُ خَيْرٌ لِّمَنِ ٱتَّقَىٰ وَلَا تُظْلَمُونَ فَتِيلًا ﴿٧٧﴾ ﴾ النساء: ٧٧

তুমি কি তাদেরকে দেখনি, যাদেরকে বলা হয়েছিল, তোমরা তোমাদের হাত গুটিয়ে নাও এবং সালাত কায়েম কর ও যাকাত প্রদান কর ? অতঃপর তাদের উপর যখন লড়াই ফরয করা হল, তখন তাদের একদল মানুষকে ভয় করতে লাগল আল্লাহকে ভয় করার অনুরূপ অথবা তার চেয়ে কঠিন ভয়। আর বলল, 'হে আমাদের রব, আপনি আমাদের উপর লড়াই ফরয করলেন কেন? আমাদেরকে কেন আরো কিছুকালের অবকাশ দিলেন না'? বল, 'দুনিয়ার সুখ সামান্য। আর যে তাকওয়া অবলম্বন করে তার জন্য আখিরাত উত্তম। আর তোমাদের প্রতি সূতা পরিমাণ যুল্মও করা হবে না'। (সূরা নিসা : ৭৭)
তার নির্দেশে তারা সংযমী হন এবং তারা তাদের হাতকে যুদ্ধ হতে বিরত রাখেন। তারা কোন প্রকার কাপুরষতা ও অক্ষমতা না থাকা সত্ত্বেও কুরাইশদের থেকে এমন এমন যুলুম নির্যাতন সহ্য করেছেন যা মানুষের অন্তরের রক্তক্ষরণ করেছিল। একজন মুসলমান শক্তি-সামর্থ ও মানবিক যুক্তিকতা থাকা সত্ত্বেও মক্কায় যেসব নির্যাতন কোন প্রকার প্রতিবাদ ও মোকাবেলা করা ছাড়া নীরবে সয়ে গেছেন তা ইতিহাসে বীরল। এ ধরনের আনুগত্য, বিনয় ইতিহাসে খুবই দূর্লভ। এমনকি যখন কুরাইশ নির্যাতনের সীমা ছড়িয়ে গেল এবং তাদের নির্যাতনের মাত্রা সকল সীমা ছাড়িয়ে একেবারে শেষপ্রান্তে পৌঁছে গেল তখন আল্লাহ তাআলা রাসূল ও তার সাথীদের নিয়ে মক্কা হতে মদিনায় হিজরতের অনুমতি দিলেন। অবশ্য মদীনা বাসীদের নিকট ইসলামের দাওয়াত পূর্বেই পৌঁছেছিল। .[24]

24- ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين، لأبي الحسن الندوي ص٧٣.

মদীনা পৌঁছার পর সেই বেদুঈন আরবরা এমন এক জাতিতে রূপান্তরিত হল, যার দৃষ্টান্ত পৃথিবী পূর্বেও উপাস্থপান করতে পারেনি এবং কেয়ামত পর্যন্ত পারবেও না। ইসলামই তাদের এমন উপমাহীন জাতিতে পরিণত করেছিল।

আল্লাহ আমাদের সকলকে ইসলামের সকল আবেদন কায়মনোবাক্যে মান্য করার তাওফীক দান করুন।

সমাপ্ত